

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 247 - 256

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

বাংলা ছোটগল্পের পালাবদলে কয়েকটি আন্দোলনের প্রভাব

শ্যামসুন্দর প্রধান

সহযোগী অধ্যাপক, সাগর মহাবিদ্যালয়

Email ID: shyampradhan73@gmail.com

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Movements,
Politics,
Literature,
Renaissance,
Romanticism,
Short Stories,
Epistles, Literar.

Abstract

Movements in literature are very significant and far-reaching, not only complementary to one another or born from one another. Two conditions of movement – protest and resistance. Protest is a collective gig of many people. The converts protested first. At the first level of protest there is logic, theory, chaos, anarchy, clamor; Discussion at the second level; Power grab at the third level. Although movement is a long-term process, it is natural that movements in time will become irrelevant in future rules. Although there were differences in the subject matter, ideologies, and ideals of the movements, all movements ultimately advanced literature and elevated traditional characters. Especially poets-writers, critics and historians call their novel creations or modern literary practices as movement. Although the first literary movement is unknown, the impact of the Renaissance has radically changed literature. The way in which Romanticism shook English literature could not be called a movement. Also in England this movement gave a new life to English literature. Although this movement did not develop in Bengal, Rabindranath made a breakthrough in his romantic imagination. The main aim of the movement is to destroy everything traditional. They wanted to break not only the traditional sense of life and art, but also the mode of expression based on intellect and emotion. Literary movement is very important from that point of view. Because, without the wave and heat of the movement, the collection of world literature cannot be diverse. Otherwise people had to be bound to the traditional literature like in the Middle Ages. Every great genius of the modern age is the inspirer of a literary movement. Although Shakespeare and Rabindranath were not associated with any movement, Shakespeare was a child of the Renaissance movement in Europe and Rabindranath is not only a product of the European romantic movement, he is also the cause of the modernist movement in Bengali literature. Although the main medium of the movement is poetry and stories, just as the beginning of the first poetry movement centered on the magazine 'Kabita', the first story magazine in the evolution of Bengali stories, 'Kallol'- Its importance is immense. Rabindranath freed the Bengali short story from its conventionality and narrative constraints and made it creative. Although new ideas appeared in social life, it was impossible to completely abandon the old

values, reforms. In the post-Renaissance era, a conflict between ancient reformist values and a reawakened sense of individualism was seen among writers. From Rabindranath to the present time, Bengali short stories have undergone many changes in the long range. Arguments, discussions and debates about literature can go on, because there is no end to anything in literature, nor is there an end to literary movements. There is room for extensive discussion in the main article on the merits of the Bengali short story alternation movement.

Discussion

সাহিত্যে আন্দোলন ব্যাপারটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী। কারণ প্রতিটি আন্দোলন একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত অর্থাৎ একটি আন্দোলন থেকে যেমন অন্য একটি আন্দোলনের জন্ম, তেমনি একটি অপরের পরিপূরক। ‘আন্দোলন’ শব্দটি সংস্কৃত থেকে বাংলা শব্দ ভাঙারে অন্তর্ভুক্ত হলেও এর মূলে রয়েছে মতানৈক্য। আবার শব্দটি বিপ্লব, বিক্ষোভ, সংগ্রাম প্রভৃতি শব্দের সঙ্গেও একাত্ম। মূলত Movement-এর বাংলা পরিভাষা আন্দোলন হলেও এর প্রধান শর্ত দু’টি - প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। প্রতিবাদ হল বহু লোকের সম্মিলিত ক্রিয়া বা সমষ্টিগত জিগির। তাই সেখানে অস্থিরতা বা উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে। আসলে কোনো একটি ব্যবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে ক্রমে মানুষের কাছে তার উপযোগিতা হারিয়ে যায়। তখন কিছু মানুষের মনে হয় যে, ব্যবস্থাটি এখন অনুপযুক্ত এবং তাকে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। তবে প্রচলিত ব্যবস্থার পক্ষেও কিছু মানুষের সমর্থন থেকে যায়। কারণ, সব ব্যবস্থাই একটি প্রতিষ্ঠান বা শক্তি। তাই কোনো ব্যবস্থার পক্ষে লোকবলের অভাব হওয়ার কথা নয়। স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তন ও স্থিতাবস্থার সমর্থকদের মধ্যে একটি সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। সংঘাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র অবস্থানটি একটি আন্দোলনের চেহারায় দেখা যায়। অথবা এই প্রক্রিয়ার যে কোনো অংশকেই আন্দোলন বলা যায়। পরিবর্তনকারীরা প্রথমে করেন প্রতিবাদ। প্রতিবাদের প্রথম স্তরে থাকতে পারে যুক্তি, তত্ত্ব, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, হৈ চৈ; দ্বিতীয় স্তরে আলোচনা; তৃতীয় স্তরে ক্ষমতা দখল। সৃষ্টিশীল ব্যাপার হলে, পুরনো ধারাকে সরিয়ে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। তাই যে কোনো আন্দোলন একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া বিশেষ। তবে যে বিশেষ দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়ায় একটি আন্দোলনের উদ্ভব বা প্রতিষ্ঠা, কালের নিয়মে সেই আন্দোলনও একদিন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে, এটাই ভবিষ্যতের নিয়ম।

রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সাহিত্য আন্দোলনের গুণগত ও মাত্রাগত প্রভেদ রয়েছে, কারণ দু’টির প্রকৃতি পৃথক। প্রথমত - রাজনৈতিক আন্দোলনে দু’টি বা একাধিক শক্তির মধ্যে রক্তক্ষয়ী ব্যাপার ঘটতে পারে, কিন্তু সাহিত্য আন্দোলনে তা অকল্পনীয় বা কল্পনার অতীত। দ্বিতীয়ত - রাজনৈতিক আন্দোলন এখন আর বিশুদ্ধ তত্ত্বের ভিত্তিতে সংঘটিত হয় না। কিন্তু সাহিত্য আন্দোলন মোটামুটি একটি তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত। তৃতীয়ত - রাজনৈতিক আন্দোলনে একটি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে, যেখানে পুরনো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু সাহিত্য আন্দোলনে পুরনো রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব থেকে যায়। তাই সাহিত্য আন্দোলন দ্রুত আন্তর্জাতিক আন্দোলনের চেহারা লাভ করে।

আন্দোলনের বিষয়, মতাদর্শ ও রূপকল্পের পার্থক্য থাকলেও সমস্ত আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং ঐতিহ্যশালী করে তুলেছে। বিশেষ করে কবি-লেখক, সমালোচক ও ঐতিহাসিকগণ তাঁদের অভিনব সৃষ্টি কিংবা নব্যরীতির সাহিত্যচর্চাকে আন্দোলন নামেও অভিহিত করে থাকেন। তবে সাহিত্যে আন্দোলন শব্দটি প্রথমে কে প্রয়োগ করেন বা প্রথম সাহিত্য আন্দোলন কোনটি তা আজও অনাবিস্কৃত। তবে একথা স্বীকার্য যে, সাহিত্যকে আমূল পাণ্টে দিয়েছে রেনেসাঁস-এর অভিঘাত। রেনেসাঁস পরবর্তী সাহিত্যের প্রকাশ ভঙ্গিটি ছিল ধ্রুপদি সাহিত্য। ক্রমে ক্লাসিসিজম, লিও-ক্লাসিসিজম এবং রোমান্টিসিজমের আবির্ভাব ঘটেছে। এদের কোনোটিকে সাহিত্য আন্দোলন না বললেও সাহিত্যের রূপান্তর কিংবা পরিবর্তনের দিক থেকে সাহিত্য আন্দোলনেরই সমধর্মী বলে মনে হয়। তবে লিও-ক্লাসিসিজমের পর যখন রোমান্টিসিজমের আবির্ভাব ঘটল তখন সাহিত্যে আন্দোলন শব্দটির প্রাসঙ্গিকতা এলো। রোমান্টিসিজম ইংরেজি সাহিত্যকে যেভাবে নাড়া দিয়েছিল তাতে একে আন্দোলন না বলে উপায় ছিল না। ইংলণ্ডে এই আন্দোলন শুধু জনপ্রিয়তা লাভ করেনি,

ইংরেজি সাহিত্যকে একটি নবজীবন দান করেছিল। বাংলায় রোমান্টিক আন্দোলন গড়ে না উঠলেও রবীন্দ্রনাথ একাই তাঁর রোমান্টিক কল্পনায় একটি যুগান্তর ঘটিয়েছেন। সাহিত্য-তাত্ত্বিকেরা রোমান্টিক আন্দোলনকে ক্লাসিক ঐতিহ্যের বিপরীত কিংবা বাস্তববাদী আন্দোলনকে রোমান্টিক আন্দোলনের বিপরীত বলে মনে করেছেন। বাস্তববাদী আন্দোলনের পরিণতি ঘটে ‘ন্যাচারালিজম’ ও ‘সোস্যালিস্ট রিয়ালিজমে’। প্রথমটিতে, মানুষ প্রকৃতির অধীন, প্রকৃতির বাইরে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। দ্বিতীয়টিতে, সামাজিক দায়বদ্ধতাকে গুরুত্বদান। মার্কসীয় দর্শনকে এই সাহিত্যদর্শ আত্মস্থ করতে চায়। সাহিত্য ক্ষেত্রে এই আন্দোলন সারা বিশ্বে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বাংলা সাহিত্যে এর প্রভাবে গড়ে উঠেছিল প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও গণনাট্য আন্দোলন। সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম বা সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদ কলাকৈবল্যবাদের বিরোধী। আবার কলাকৈবল্যবাদ থেকে অক্ষরবাদের জন্ম। এরপর আসে প্রতীকবাদী আন্দোলন, এক্সপ্রেশনিষ্ট আন্দোলন, ইম্প্রেশনিষ্ট আন্দোলন, ইমেজিস্ট আন্দোলন, ডাডা আন্দোলন, পরাবাস্তববাদী আন্দোলন প্রভৃতি। সমস্ত আন্দোলনের লক্ষ্যই ছিল প্রথাগত যা কিছু আছে তাকে ধ্বংস করা। শুধু প্রচলিত জীবনবোধ ও শিল্পবোধ নয়, বুদ্ধি ও অস্বয় নির্ভর প্রকাশ রীতিকেও তারা ভাঙতে চেয়েছিলেন। সেদিক থেকে সাহিত্য আন্দোলন ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আন্দোলনের তরঙ্গ ও উত্তাপ ছাড়া বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারটি বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে পারত না। তা না হলে মধ্যযুগের মতো গতানুগতিক সাহিত্যে আবদ্ধ হতে হত মানুষকে। পাশাপাশি আধুনিক যুগের যেকোনো বড় প্রতিভাও সাহিত্য আন্দোলনের প্রেরণাদানকারী। শেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথ কোনো আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও শেক্সপীয়র ছিলেন ইউরোপের নবজাগরণ আন্দোলনের সন্তান, অন্যদিকে ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলন না ঘটলে আমরা কোন্ রবীন্দ্রনাথকে পেতাম? রবীন্দ্রনাথ শুধু ইউরোপীয় রোমান্টিক আন্দোলনের ফসল নন, তিনি বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতাবাদী আন্দোলনেরও কারণ। বাঙালি নবীন সাহিত্যিকদের তিনি যেমন আরাধ্য ছিলেন, তেমনি ছিলেন আক্রমণেরও স্থল। তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভাকে অতিক্রম করে নতুন কিছু সৃষ্টির জন্য বাংলা সাহিত্যে নানা আন্দোলনের সূচনা হয়েছে।

পাশাপাশি স্বার্থ ও একগুঁয়েমি রোধেও জন্ম হয়েছে আন্দোলনের। আবার কখনো নিজের মতকে জাহির করতে বা স্বীকৃতি দিতে বা সমস্ত সিস্টেমকে পরিবর্তন করতে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে উঠেছে। তবে কোনো আন্দোলনই চিরস্থায়ী নয়। রুটি রুজির ব্যাপারে আন্দোলন কথাটি যতটা মানানসই সাহিত্যের ক্ষেত্রে ততটা নয়। কারণ যুগে যুগে সাহিত্য মানুষের হৃদয়কে নিয়ে খেলা করেছে। বিশেষ করে পাঠকের মন জয় বা নিজের মনের কথা প্রকাশের জন্য সাহিত্যিক বারবার ভাবনা, উপস্থাপন রীতি এবং বিষয় বিন্যাসে এনেছেন নানা পরিবর্তন। ‘আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান’-এ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, -

“কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মিটিং মিছিল ঘেরাও হরতাল প্রচার বহুল আলোচনা ইত্যাদি দ্বারা লক্ষ্যপূরণ প্রতিকার বা পরিবর্তনের চেষ্টা করা, উত্তেজনা সঞ্চারণ, বিক্ষোভ”^১ ইত্যাদি।

‘বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন-দশক’ গ্রন্থে সন্দীপ দত্ত এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, -

“সাহিত্যের ক্ষেত্রে আন্দোলন বলতে তাই বুঝবো যা সাহিত্যকে অন্য খাতে বইয়ে দিয়ে সাহিত্য ধারার পরিবর্তন ঘটায়, গতানুগতিকতাকে অস্বীকার করে নতুনত্বের সন্ধানী হয়, চিরাচরিত ধারাকে সমালোচনার কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে সাহিত্যের নানান পরীক্ষা চালায় এবং সাহিত্যের সাময়িক কিংবা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে যায়।”^২

শুদ্ধসত্ত বসুর মতে -

“সাহিত্যিকার নতুনরূপে নববিন্যাসে নতুন ভাষা ও অলঙ্কারে তাঁর চিন্তার ফসল পাঠকের কাছে তুলে ধরেন; সাহিত্য সৃষ্টির এই প্রেরণা থেকেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিবিধ আন্দোলন। প্রচলিত রীতি ও ছকের বাইরে এসে নতুনভাবে নতুন কথা বলার জন্যে প্রকৃত স্রষ্টা ব্যাকুল হন, ব্যাকুলতাই তাঁকে নতুন ভাষা জোগায়, পথ বাৎলে দেয়, এইভাবে নতুন রীতির জন্ম এবং এই রীতি এক থেকে অনেকে, শেষে দল থেকে শত শত দলে যখন সঞ্চারণিত হয়, তখনই তাকে সাহিত্যীয় রীতির আন্দোলন বলে আখ্যাত করা হয়ে থাকে।”^৩

কাব্য জীবনের মুকুর হলেও এই জটিল যুগে বিষয়টি যে আরও জটিল তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ১৯১৪ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল পৃথিবীর পক্ষে একটা বিরাট ভাঙা-গড়ার যুগ। এই সময় রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। ফলে মানুষের জীবনদর্শন ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে পুরনো ধারণা ও বিশ্বাস ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল। এই পরিবর্তন ইউরোপে শুরু হলেও তার আকৃতি ও প্রকৃতি প্রথমে ছিল অস্পষ্ট। বাংলা সাহিত্যে তার চেউ এসে পৌঁছেছিল আরও ৮-১০ বছর পরে। আধুনিক বাংলা কবিতার সূত্রপাত সম্ভবত এখান থেকেই। তবে চিন্তা জগতের এই পরিবর্তনগুলি সরাসরি কাব্যজগতে প্রবেশ না করলেও তার যে ভাব মণ্ডলটি তৈরি হয়েছিল তা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট রূপে ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে ধরা পড়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী গণতন্ত্রের ভিত সুদৃঢ় হওয়া, যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে স্বরাজ আসার সম্ভাবনা, অহিংসবাদী গান্ধীজীর সেনা সংগ্রহের মতো বিষয়গুলির মোহভঙ্গের ফলে গান্ধীজী সেই মোহভ্রষ্ট অপমানিত জাতিকে অসহযোগের পথ দেখিয়েছিলেন। ফলে এতদিনের স্থাবর সমাজে হঠাৎ যেন একটা গতি এল। অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল। ১৯৩০-৩১-এর দ্বিতীয় সত্যগ্রহ আন্দোলন এই প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল। ঠিক এই সময় বাংলাদেশে চলছিল সশস্ত্র বিপ্লব। জীবন ও মৃত্যুর জুয়াখেলায় গঠিত মধ্যবিত্ত জীবনের হিসেবী মন এক রোমান্টিক বিস্ময়ের আত্মদ পেয়েছিল। পাশাপাশি সবকিছু ভাঙতে হবে, এই নেতিবাচক মন্ত্রেও দেশ উদ্ভুদ্ধ হতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর অসহযোগ বা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব কোন সমাধানকেই মনে নিতে পারেননি। কারণ, তিনি মনে করেন মানুষের বিকাশের পথে এগুলি অন্তরায় ছাড়া আর কিছু নয়। তাই ভবিষ্যতে এই আন্দোলন যে ব্যর্থ হতে বাধ্য এমন ভবিষ্যৎ বাণীও করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো মার্ক্সপন্থী বা সাম্যবাদীরাও এর বিরোধী ছিলেন। ১৯২৭-২৮-এ ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ মীরাট ফড়যন্ত্র মামলায় তাঁদের কার্যকলাপ জনসাধারণকে প্রথম আকৃষ্ট করে। তবে কমিউনিস্টরা অসহযোগ, অহিংসা এমনি কি সন্ত্রাসবাদেরও ছিলেন বিরোধী। কারণ তাতে কৃষক ও শ্রমিকের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না। পাশাপাশি আধুনিক কবিদের কৈশোর ও যৌবন এই বিভিন্ন চিন্তাধারার ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত। লক্ষ্য ও পথ নিয়ে দেশব্যাপী অনিশ্চয়তা তাঁদের অনুভূতি প্রবণ মনকে যে বিভ্রান্ত করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই বিভ্রান্তি আরও বেড়েছিল ১৯২৯-৩০-এর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে।

আন্দোলনের মূল মাধ্যম কবিতা ও গল্প হলেও ‘কবিতা’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যেমন প্রথম কবিতা আন্দোলনের সূত্রপাত, তেমনি ছোটগল্পের বিবর্তনে ‘কল্লোল’ পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। আবার এটি বাংলা ভাষায় প্রথম গল্পের পত্রিকা। বাংলা ছোটগল্পকে তার গতানুগতিকতা ও বর্ণনার ঘনঘটা থেকে মুক্ত করে সৃজনশীল করে তোলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ ‘হিতবাদী’ (১৮৯১) পত্রিকার মাধ্যমে প্রথম পাওয়া গেল ছোটগল্পের সার্থক স্রষ্টাকে। বিষয় বৈচিত্র্য, ভাষা, উপস্থাপনা, প্লট নির্মাণে বাংলা ছোটগল্পকে অনন্য করে তোলেন রবীন্দ্রনাথ। আসলে ছোটগল্পের জন্ম লুকিয়ে থাকে যুগ যন্ত্রণার মধ্যে। সমাজ জীবনে নতুন ভাবনা দেখা গেলেও পুরনো মূল্যবোধ, সংস্কারকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া অসম্ভব ছিল। রেনেসাঁস-পরবর্তী যুগে নবজাগ্রত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের সঙ্গে প্রাচীন সংস্কার-মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছিল সাহিত্যিকদের মধ্যে। স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্পে এই সংঘাত ধরা পড়লেও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন মূল্যবোধ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। বীরবল ওরফে প্রমথ চৌধুরী সচেতন মন, স্বভাবসিদ্ধ রুচি, স্বতন্ত্র মেজাজ ও মনীষার সহযোগে সরল গদ্যভাষায় বাংলা ছোটগল্পে সমকালীন ভাবধারাকে সঞ্চারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ফরাসী সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত থেকে জন্ম ব্যাঙ্গাত্মক ও শানিত ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে আবেগে ঢলে পড়া ভাবের পরিবর্তে যুক্তিসম্পন্ন ভাবের গল্পে নানা আঙ্গিকের বৈচিত্র্য এনেছিলেন। তাঁর গল্পে একধরনের মজলিশী পরিবেশ পাওয়া যায়, যা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের থেকে আলাদা। বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসুর গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য স্নিগ্ধ বিদ্রুপ – যার মূলে ছিল সমাজ সচেতনতা। তিনি স্যাটায়ারধর্মী হাস্যরসের মাধ্যমে সমাজের মেকি ও ক্রটিযুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, মানুষকে সচেতন করতে হলে তত্ত্বজ্ঞানের পরিবর্তে হাস্যরসই শ্রেয়। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ পরশুরামের ‘গডডালিকা’ পড়ে মন্তব্য করেছিলেন, -

“সহসা ইহার অসামান্যতা দেখিয়া চমক লাগিল। বইখানি চরিত্রচিত্রশালা। তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি।”^৪

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের কল্লোলের লেখকরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে বড় হয়ে উঠেলেও ইউরোপে মানুষের চিন্তাজগতে যতটা পরিবর্তন এসেছিল, আমাদের দেশে তার চেয়ে অনেক কম হলেও মনের ভাবধারাটি সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল। এই বদলে যাওয়া সময়ে কল্লোলের লেখকরা সচেতনভাবে রবীন্দ্রনাথের শান্ত, সুন্দর বৃত্তের বাইরে স্বতন্ত্র জগত নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কল্লোল (১৯২৩), কালিকলম (১৯২৬), প্রগতি (১৯২৭) - এই তিন পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কল্লোল যুগের ছোটগল্পের প্রকাশ। এর পাশাপাশি বসুমতী, প্রবাসী, উত্তরা, আত্মশক্তি, ধূপছায়া প্রভৃতি পত্রিকাও ছিল। সেইসঙ্গে ১৯১৩-১৪-এ ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের প্রচার, ফ্রয়েড শিষ্যের দেহবাদী ব্যাখ্যা, বার্নার্ড শ'র নতুন চিন্তাধারা, ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব, ১৯১৯-এর মানবেন্দ্রনাথ রায়-এর সাম্যবাদী আন্দোলন, ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলন, ১৯২৮-এ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, ১৯৩১-৩৫-এ মার্কস-লেবিনের দর্শন চিন্তা প্রভৃতি কল্লোলের লেখকদের উপর প্রভাব ফেলেছিল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ কুমার সান্যাল প্রমুখরা ছিলেন কল্লোল-এর নতুন ধরার লেখক। ফলে তাদের মধ্য থেকে প্রেম ও ঈশ্বরের বিশ্বাস হারিয়ে গিয়ে নেমে এসেছিল যুগসন্ধিক্ষণের দিগন্তজোড়া সমস্যা ও হতাশা। এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মুক্তির চেষ্টা থাকলেও সেই মুক্তি কোন পথে আসবে সে সম্পর্কে তারা ছিল অজ্ঞ। বিশ শতকের দুই তিন দশকের বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকেরা এই আবহেই ঘোরাফেরা করেছিলেন। তাই তাদের গল্প হয়ে উঠেছিল মনন প্রধান নাগরিক মধ্যবিত্তের গল্প।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে কল্লোলোত্তর বা কল্লোল যুগের সূচনা। এই পর্বের ন'বছরে (১৯৩৯-৪৭) সমাজ জীবনে দেখা গেছে নানা ভাঙা-গড়া এবং তার প্রতিফলন ঘটেছে ছোটগল্পে। তারপর স্বাধীনতা পরবর্তী কমিউনিস্ট আন্দোলন, নকশাল আন্দোলনের যুগে ছোটগল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্তের কপটতা, শ্রেণিদ্বন্দ্বের নিষ্ঠুরতা, নৈরাশ্য, চরম মূল্যবোধহীনতা ও দিশাহীন-স্বপ্নহীন ভবিষ্যতের রূপায়ণ ইত্যাদি। যাইহোক বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের দুর্ভিক্ষ বাংলা ছোটগল্পের পটকে করেছিল পরিবর্তন। এই সময় শুরু হয়েছিল প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকদের আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন প্রভৃতি। বাংলা ছোটগল্পে ভাববাদের জায়গায় ঢুকে পড়েছে বস্তুবাদ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে কল্লোল যুগের সুর নিহিত ছিল। বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-৭৪) গল্পে বাস্তব তিক্ততা থাকলেও আশা, ভালোবাসা, সৌন্দর্য, কবিতাসুলভ আবেগ, স্মৃতি মেদুরতা, মানসিক ঘাতপ্রতিঘাত, আঙ্গিক সচেতনতা প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। কল্লোল গোষ্ঠীর আর এক লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬) ছিলেন বুদ্ধদেব বসুর বিপরীত অনুভূতির লেখক। তাঁর গল্পে ব্যক্তিত্বের অস্থিরতা, নিয়ম-ভাঙার প্রবণতা, যৌবনের উন্মাদনা প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। ‘শতগল্প’ সংকলনের ভূমিকায় ছোটগল্পের আঙ্গিক বিষয়ে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, -

“ছোটগল্প লেখবার আগে চাই ছোটগল্পের শেষ, কোথায় সে বাঁক নেবে, কোন্ কোণে। শুধু ঘটনা যথেষ্ট নয়, শুধু চরিত্র যথেষ্ট নয়; চাই আবার সমাপ্তির সম্পূর্ণতা। তার বাণ শব্দভেদী নয়, লক্ষ্যভেদী। - সবশেষে চাই সেস অফ ফর্ম বা আকার চেতনা।”^৫

সেই সঙ্গে বাস্তব ও সমাজ সচেতন গল্পে প্রথম পাওয়া গেল অন্ত্যজ, খেটে খাওয়া ও বস্তির মানুষকে। যাইহোক রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্পের ১০০ বছরের সময়সীমায় নানা পালাবদল ঘটেছে। ছোটগল্পের এই পালাবদলে পত্রপত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম।

ভারতের বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য আন্দোলনের (হিন্দীতে ‘ছায়াবাদী’ আন্দোলন, ওড়িয়া ভাষায় ‘সবুজ গোষ্ঠী’ আন্দোলন, মহারাষ্ট্রে ‘দলিত সাহিত্য’ আন্দোলন প্রভৃতি) মতো বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও আন্দোলনের জোয়ার ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে তার মূলে কাজ করেছিল ছোটো ছোটো পত্রিকা, ইস্তাহার বা ম্যানিফেস্টো ধরনের প্রচার মাধ্যম। এই সমস্ত আন্দোলনের উৎসক্ষেত্র কলকাতা থেকে বহু দূরে কোনো মফস্বল হলেও এর কাণ্ডারী ছিলেন শিক্ষিত ও মেধাবী মানুষজন - যারা দেশি-বিদেশী সাহিত্যরস আন্বাদনে ছিলেন সমান দক্ষ। সন্দীপ দত্ত তাঁর ‘লিটল ম্যাগাজিনের ইস্তাহার ভিত্তিক আন্দোলন’ নিবন্ধে লেখেছেন, -

“বাংলা ভাষায় ঘোষিত আন্দোলন সম্ভবত ‘সবুজপত্র’-কে কেন্দ্র করেই। প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ‘সবুজপত্র’-র প্রকাশ। ভাষা আন্দোলনে ‘সবুজপত্র’ বড় ভূমিকা নিয়েছিল। চলিতভাষা আন্দোলনে এই পত্রিকা অগ্রণী ভূমিকা থেকে সমসাময়িক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আঘাত দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নামক প্রতিষ্ঠানও তাঁর গদ্যরীতিকে পাণ্টে ফেলেছিলেন ‘সবুজপত্র’-এর তাহাদে।”^৬

বাংলা সাহিত্যের পালাবদলের ক্ষেত্রে সবুজপত্রের কিঞ্চিৎ ভূমিকা থাকলেও এই পত্রিকা কোন আন্দোলন নেয় নি। কোনো কোনো সমালোচকের মতে বাংলা সাহিত্যে প্রথম আন্দোলনের সূত্রপাত ‘কল্লোল’ (১৯২৩) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। তারপর আত্মপ্রকাশ করে ‘কালিকলম’ (১৯২৬), ‘প্রগতি’ (১৯২৭), ‘পরিচয়’ (১৯৩১), ‘কবিতা’ (১৯৩৫) ইত্যাদি। এই পত্রিকাগুলির উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্তি, পাশ্চাত্য অনুকরণ, যৌনতাকে কৌশলে সাহিত্যে স্থান দান, মার্কসীয় দর্শন ও সাম্যবাদ প্রচার ইত্যাদি। এই পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে নবজোয়ার দেখা দিলে কেউ কেউ এদের বলেন বাংলা সাহিত্যের নব আন্দোলনের পত্রিকা বা আধুনিক পত্রিকা। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুরই পরিবর্তন লক্ষিত হয়। যুবসমাজ চিরকাল সহজ পথে চলার বিরোধী। কাজেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বদা উন্মুখ থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে বিশ শতকের পাঁচের দশকে প্রকাশিত দু’টি পত্রিকার [শতভিষা (১৯৫১) ও কৃতিবাস (১৯৫৩)] মধ্য দিয়ে একদল শিক্ষিত তরুণ সাহিত্যে পরিবর্তন আনতে চেয়ে সফল হয়েছিলেন। তবে এই দু’টি পত্রিকার কোনো একটিকে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা অনুচিত। তবে পালাবদল নিশ্চয়ই ঘটেছিল, সে বদল যে ওই দু’টি বা একটি পত্রিকার মাধ্যমে ঘটেছিল তা নয়। ঔপনিবেশিক চিন্তা থেকে বাঙালি জীবনে যে চিন্তার প্রতিষ্ঠা তা কল্লোল-কালিকলম-কবিতা-শতভিষা-কৃতিবাস-নতুন রীতির বহু আগেই ঘটেছিল। যেমন ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজির অনুপ্রবেশ কিংবা ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপীয় ভাবনার প্রভাবের ফলে জন্ম নিয়েছিল এমন এক বাঙালি যারা নিজেদের ভূমি থেকে উৎপাটিত। যাইহোক ছয়ের দশক থেকে বেশকিছু পদ্য-গদ্য আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে।

বিশ শতকের পাঁচের দশকের শেষে ‘ছোটগল্প : নতুন রীতি’ নামে স্বল্পায়ু একটি পত্রিকা ও ওই নামে একটি আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিলেন বিমল কর। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ ‘গল্পপত্র’ প্রকাশ পর্যন্ত এই আন্দোলনের মূল ভাবনাটি সজীব ছিল। মাত্র পাঁচটি সংখ্যা এর স্থায়িত্বকাল হলেও নতুন গল্পকারদের উৎসাহদানে তাঁর (বিমল কর) জুড়ি মেলা ভার। মূলত তাঁর চেষ্টায় ষাটের দশকে নতুন ধারায় যারা গল্প লিখেছিলেন তাঁদের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত গল্পকার হয়ে উঠেছিলেন। এই আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাঁদের দাবি ছিল, আমরা আমাদের মতো করে গল্প লিখব। ফলে বাঙালি পাঠকের রুচি-ইচ্ছা-মর্জি নিয়ে গল্প লিখতে রাজি নন। সেই সঙ্গে ছোটগল্পের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইস্তাহারে ছিল, -

“ছোটগল্পকে ছোট এবং গল্প হতে হবে - এই প্রচলিত ধারণার শরিক আমরা নই। সাহিত্যগত যে তত্ত্ব তাতে অবশ্য ছোটগল্পকে বলা হয়েছে, পাঠক যা এক দফায় পড়ে ফেলতে পারে। কোনো লেখা সম্পর্কেই চূড়ান্ত কোন তত্ত্ব সম্ভব নয়। কোনো শিল্পের ক্ষেত্রেই বাঁধা তত্ত্ব শিল্পীকে তার প্রার্থিত স্বর্গে পৌঁছে দেয় না। গল্প কথাটিরও প্রচলিত যে ব্যাখ্যা, আমরা তার সমর্থন করি না, কিংবা বলা ভাল, বাহ্য ঘটনা পরস্পরা দিয়ে যে কাহিনী গ্রন্থন আমরা তাকে শিল্পময় গল্প বলতে কুণ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে ঐতিহ্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে অনেক কুশলী লেখকের হাতে সেই শ্রোতের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস সত্ত্বেও অধিকাংশ বাঙালী পাঠকের গল্প পাঠের প্রত্যাশা অত্যন্ত স্থূল ধরনের। লেখকরাও যেন পাঠকের এই চাহিদা পূরণকেই মেনে নিয়েছেন। গল্প যতকাল নিছক গল্প ছিল, ততকাল পাঠক ছিল শ্রোতা। গল্প যখন থেকে কাব্যের ঐশ্বর্য গ্রহণ করল, তখন থেকে পাঠক আর শ্রোতা থাকল না, লেখকের অভিজ্ঞতার সাথী হল। অর্থাৎ কৌতূহল মিটিয়ে সে তৃপ্তি পেল না, অন্যের অনুভূতি সবিস্তারে অনুভব করতে পারল। আধুনিক কবিরা যেমন তাঁদের নতুন অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কাব্যের পূর্ব রীতি ভেঙেছেন, তেমনি -- ছোটগল্পের লেখকরা নতুন সুরা পুরনো বোতলে ভরতে রাজি নন। - ছোটগল্পে নতুন দিগন্ত বোধ করি একেই বলে।”^৭

পাশাপাশি ‘ছোটগল্প : নতুন রীতি’ কি কোন সাহিত্য আন্দোলনের মুখপত্র? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, -

“ছোটগল্পের প্রচলিত রীতি প্রকরণের ধরা বাঁধা গণ্ডীর কথা যদি লেখককে সর্বদা স্বতঃসিদ্ধের মতো পালন করে চলতে হয়, তাহলে আধুনিক মনন প্রধান বাস্তবতা (অন্তর্বাস্তবতা) ঠিকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ছোটগল্পের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তাই বি-নির্মানের প্রয়োজনীয়তা অবধারিত হয়ে উঠেছিল। দরকার পড়েছিল নতুন লেখকের, যারা নতুন ভাবে ভাববে এবং সাহসিকতার সঙ্গে লিখবে। শব্দ কিম্বা বাক্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে অকারণ সংস্কারচ্ছন্ন হবে না।”^৮

বিষয়, শৈলী বা ফর্ম, গদ্যরীতি বা বলার ভঙ্গিমা প্রভৃতি নতুন নতুন ভাবনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষায় বিমল করের আগ্রহ ছিল সবার চোখে পড়ার মতো। গল্পের ভেতরে গল্পের বহির্বাস্তবতাকে সরিয়ে রেখে অন্তর্বাস্তবতাকে তিনি তুলে এনেছিলেন অন্য এক গদ্যরীতি ও আঙ্গিকের মাধ্যমে। ফলে যে গল্প এতদিন ছিল কাহিনি-সর্বস্ব, নির্দিষ্ট পরিণতি-নির্ভর ও অন্তিম-চমকে আবদ্ধ, তিনি এসব বিষয়কে সরিয়ে গল্পে নিয়ে এলেন এক অন্তিমুখীন বোধ। তাই তাঁর গল্পে গোলগাল বিষয়ের (রাউণ্ড স্টোরি) কোনো গুরুত্ব নেই। কারণ গল্পহীনতাকে তিনি কখনও প্রশয় দেন নি। অন্তর্বাস্তবতার সত্য উদ্ঘাটনে কোনো শুচিবায়ুকে প্রশয় না দিয়ে একদল তরুণ লেখকদের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তাঁর ‘ছোটগল্প : নতুন রীতি’ একটি আন্দোলন ছাড়া আর কিছু নয়।

ছয়, সাত ও আটের দশকে ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহারকে সামনে রেখে বাংলা ছোটগল্প কেন্দ্রিক আন্দোলনগুলি হল- (১) হাংরি আন্দোলন, (২) শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, (৩) নিম্ন সাহিত্য আন্দোলন, (৪) গল্পতন্ত্র ও চাকর সাহিত্য বিরোধী আন্দোলন, (৫) ঘটনা প্রধান গদ্য, (৬) নতুন নিয়ম, (৭) ছাঁচে ভেঙে ফেলো, (৮) সমস্বয়ধর্মী গল্প, (৯) গাণিতিক গল্প, (১০) থার্ড লিটারেচার।

১) হাংরি আন্দোলন - ছয়ের দশকে অর্থাৎ ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে ‘হাংরি জেনারেশন’ পত্রিকার মাধ্যমে এই আন্দোলনের সূচনা। এর প্রধান কাণ্ডারী ছিলেন মলয় রায়চৌধুরী। প্রথমে কবিতার মাধ্যমে এই আন্দোলনের শুরু হলেও পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গদ্য। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল প্রথমে নিজের অন্তিত্বকে প্রমাণ করা। তারপর সমস্ত রকম মূল্যবোধকে ধ্বংস করা, শব্দকে আক্রমণাত্মক করা, কোনো রকম ছুঁৎমার্গ না রাখা, যা প্রচলিত ও গতানুগতিকতাকে বিরোধীতা করা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে নগ্নতা ও ত্রুরতা, বন্দীত্ব থেকে মুক্তি, নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে জীবনকে জানার চেষ্টা, বাক্যকে ছোটো ছোটো করে সাজানো, পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার না করা কিংবা সাধু-চলিতকে পাশাপাশি ব্যবহার করে গল্পের আঙ্গিক গঠনই এদের লক্ষ্য ছিল।

২) শাস্ত্রবিরোধী - ছয়ের দশকে অর্থাৎ ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চে ‘এই দশক’ নামে গল্প পত্রিকার মাধ্যমে এই আন্দোলনের সূচনা। এর প্রধান কাণ্ডারী ছিলেন রমানাথ রায়। এই পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, -

“সময় হয়েছে যা কিছু পুরানো তাকে বর্জন করবার, সময় হয়েছে যা কিছু নতুন তার জন্যে প্রস্তুত হবার। - ছোটগল্প আজ থেকে সমস্ত শর্তের বিরুদ্ধে। ছোটগল্প এখন কবিতার মতোই স্বাধীন এবং মুক্ত। আমরা যা লিখব, যেমন করে লিখব তাই ছোটগল্প।”^৯

এমন দ্বিধাহীন বলিষ্ঠ বক্তব্য দিয়েই শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। এই গল্প আন্দোলনের ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহারে ছিল চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় - (ক) গল্পে আমরা আমাদের কথা বলব, (খ) আমরা এখন বাস্তবতায় ক্লাস্ত, (গ) অতীতের মহৎ সৃষ্টি অতীতের কাছে মহৎ আমাদের কাছে নয়, (ঘ) গল্পে যারা কাহিনি খুঁজবে তাদের গুলি করে মারা হবে। তবে আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিদেশিদের প্রভাব নিশ্চয়ই পড়েছিল। এই সময়ের গল্প লেখকরা শুধু গল্পের বিষয় নয়, আঙ্গিক, ভাষা, অলঙ্কার, প্লট ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আগ্রহী ছিলেন।

“কোন আন্দোলনই চিরস্থায়ী নয়। সময়ের অনিবার্য পরিণতিতে আবির্ভূত হয়ে প্রয়োজন মতো নিজের দায়দায়িত্ব সেয়ে ভিন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তোলার মধ্যেই নিহিত থাকে কোনো আন্দোলনের সার্থকতা। তাই এই আন্দোলনও কোনো অনড় ব্যাপার নয়।”^{১০}

সুব্রত সেনগুপ্ত যথার্থই বলেছেন, “আমরা শাস্ত্রবিরোধীতারও বিরোধী।” নিজেদের অন্তর্জগতের কথা তাঁরা বলতে চেয়েছেন ব্যক্তিগত আঙ্গিকে।

৩) নিম সাহিত্য – সাতের দশকের গোড়ায় অর্থাৎ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি ‘নিম সাহিত্য’ পত্রিকার মাধ্যমে কলকাতা থেকে দূরবর্তী দুর্গাপুর শিল্পনগরীর একদল কল-কারখানার কর্মী সুধাংশু সেন, রবীন্দ্র গুহ, বিমান চট্টোপাধ্যায় ও মৃগাল বণিক প্রমুখ এই আন্দোলনের সূচনা করেন। এই পত্রিকার নকশা, বিষয় ইত্যাদির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ গুহের অবদান থাকলেও পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন সুধাংশু সেন ও বিমান চট্টোপাধ্যায়। শিল্প প্রধান অঞ্চলে যেখানে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন সক্রিয়, ট্রেড ইউনিয়ন অটুট, সেখানে নিম সাহিত্য সম্পূর্ণ অন্য রকমভাবে সাহিত্যে বিস্ফোরণ ঘটালো।

৪) গল্পতন্ত্র ও চাকর সাহিত্য বিরোধী গল্প আন্দোলন – সাতের দশকের গোড়ায় অর্থাৎ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে সুব্রত সেনগুপ্তের সম্পাদনায় ‘গল্প’ পত্রিকার মাধ্যমে এই আন্দোলনের সূচনা। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখেছেন, -

“সাহিত্য ক্রমশঃ চাকরদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে। এদের কেউ রাজনীতির আবার কেউ বক্তব্যের চাকর। আমরা চাই সাহিত্যকে চাকরদের হাত থেকে মুক্ত করতে। আমাদের পত্রিকা সাহিত্যকে মুক্ত করার এই আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে উঠুক। কিন্তু সাহিত্যকে আমরা কোন কিছু হাতিয়ার করতে চাই না।”^{১১}

৫) ঘটনা প্রধান গদ্য – সাতের দশকের গোড়ায় ‘এবং নৈকট্য’ পত্রিকার মাধ্যমে এই আন্দোলনের সূচনা। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই আন্দোলনের স্থায়ীত্বকাল। এর প্রধান কাণ্ডারী ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সাঁতরা। এখানে গল্প লেখার চিরাচরিত পদ্ধতিকে মানা হয়নি। তাঁদের মতে গল্প বানানো হয়ে থাকে। তা ছাড়া ‘গল্প’ শব্দটির পরিবর্তে ‘ঘটনা’ শব্দটির ব্যবহারে তারা বেশি উৎসাহী। কারণ ঘটনা জমতে জমতে ঘটনার বিরাট যে যোগফল দাঁড়ায়, তা ঘটনাই। এর মধ্যে মিথ্যা, চিন্তার টানাপোড়েন, ইঙ্গিতময়তা থাকে না, থাকে না কোনো ধরনের গল্প। শধু দেখা ও শোনার কাজগুলি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিবৃত হয় মাত্র।

৬) নতুন নিয়ম – সাতের দশকের শেষদিকে অর্থাৎ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ‘নতুন নিয়ম’ পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে এই আন্দোলনের সূচনা। এর প্রকাশক ছিলেন আশিস মুখোপাধ্যায়। এই আন্দোলন প্রসঙ্গে পার্থ গুহবক্সী তাঁর ‘নিয়মভঙ্গকারী একজন’ প্রবন্ধে বলেছেন, -

“সাহিত্যকে যখনই স্থূল কিছু নিয়মের মধ্যে বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, চিন্তায় স্বাধীন কিছু মানুষ তখনই বারবার তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এই ইতিহাস হয়তো নতুন নয়। কারণ আমরা দেখতে পেয়েছি আধুনিকতার গিল্টি করা সাহিত্যের পিছনে এখনো গোঁড়া মনোবৃত্তি কাজ করে চলেছে। যে কামিনী কাহিনী নির্ভর গল্পকে এক সময় নিরোধ করা হয়েছিল, তাকে আবার কবর খুঁড়ে সুকৌশলে উদ্ধার করা হচ্ছে। এই মুহূর্ত থেকে গল্পের এইসব অকাল বান্ধবদের বিরুদ্ধে আমাদের মিলিত শক্তি প্রয়োগ করা হবে।”^{১২}

‘নাতিদের গল্প’ নিবন্ধে তীর্থঙ্কর নন্দী লিখেছেন, “সব নিয়ম জানা সত্ত্বেও আমরা কখনো সাহিত্যের নতুন ‘আমি’তে স্বাভাবিক হতে পারি না। পুরনো ‘আমি’ তখনও আমাদের মনে মনে শোভা পেতে থাকে। - সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ‘আমি’রও যে বদলায় কখনও বুঝতে চাই না।” একশো বছরের পুরনো ‘আমি’ আজ আর সাহিত্যে নেই। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক সময় আমরা দেখতে পাই সাহিত্যে লেখকের সরাসরি ছাপ বা উপস্থিতি। ‘আমি’ দিয়েই যেন লেখক সব বোঝাতে চায়। লেখা শুরু হয় ‘আমি দিয়ে।’^{১৩}

৭) ছাঁচে ভেঙে ফ্যালো – ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে অমল চন্দ ‘ছাঁচে ভেঙে ফ্যালো’ প্রবন্ধে বলেছিলেন, -

“কোনও সমস্যা নিয়ে গল্প লেখার দিন আর নেই, কিন্তু গল্প লেখার সমস্যাটা আছে, থেকে যাবে। ইচ্ছা হলেই একটা গল্প ফাঁদা চলে, গল্প লেখা চলে না। দ্বিতীয়টা নিয়েই সমস্যা, প্রথমটা ছাঁচে ঢালা। ছাঁচে ঢেলে দিলে প্রথমটা হতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয়টার বেলায় কোন ছাঁচ নেই বলেই ভাবতে হয় কেমন করে লিখব।”^{১৪}

শাস্ত্র বিরোধী গল্প আন্দোলনেও এই পুরনো ছাঁচকে ভাঙা হয়েছে।

৮) সমস্বয়ী-ধর্মী গল্প - ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অজিত দেব ও সুধীর দাস-এর সম্পাদনায় 'সমস্বয়ী-ধর্মী গল্প' নামে একটি পত্রিকার মাধ্যমে এই আন্দোলনের সূচনা। এরা ছিলেন গতানুগতিক গল্পধারার বিরোধী।

৯) গাণিতিক গল্প - ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে কলকাতার কলেজে পড়া গণিত বিভাগের ছয় ছাত্র 'ছয়' পত্রিকার মাধ্যমে গাণিতিক গল্প আন্দোলনের সূচনা করেন। এই আন্দোলন সম্পর্কে কোনো ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহার প্রকাশ না করলেও পত্রিকার উদ্দেশ্য ও গাণিতিক গল্প সম্পর্কে মতামত প্রকাশক হতে থাকে।

১০) থার্ড লিটারেচার - ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও শৈবাল মিত্রের সম্পাদনায় 'কবিপত্র প্রকাশ' (পূর্বনাম 'কবিপত্র') নামক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ২৫ বছরে পদার্পণ করে থার্ড লিটারেচার আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে ফেলে।

সবশেষে বলা যায় সাহিত্য নিয়ে তর্ক হতে পারে, আলোচনা চলতে পারে, এমনকি মতান্তর হতেও পারে, তবে সাহিত্যে কোনো কিছুর শেষ নেই প্রসঙ্গত সাহিত্য আন্দোলনেরও। তবে লেখাটি শেষ করবো দেবেশ রায়-এর 'ছিন্নভিন্ন এই সময়ের আধুনিকতা' (১৩৮৩-র সাহিত্য সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকা) প্রবন্ধের কিছু অংশ উল্লেখের মধ্য দিয়ে, -

“আধুনিক গল্প আন্দোলনের ঐতিহাসিক সাফল্য-ব্যর্থতার হিসেব না করলেও বলা যায় এই আন্দোলনের ব্যপকতায় বাংলা গল্প ও উপন্যাসের ভাষার ও নির্মিতির এমন এক পরিবর্তন এসেছিল, যার টানে বয়স্ক ও প্রতিষ্ঠিত লেখকদেরও অনেকে তাঁদের অভ্যস্ত স্টাইল ছেড়ে এই ভাষা নির্মিতি গ্রহণ করেছিলেন।”^{২৫}

ছোটগল্পের পালাবদলে আন্দোলনের সার্থকতা বোধ হয় এখানেই।

Reference:

১. দত্ত, বিজিতকুমার, সরকার পবিত্র, চাকি জ্যতিভূষণ, রায় সুবোধরঞ্জন, মুখোপাধ্যায় অশোক, মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় সনৎকুমার, সাহা নৃপেন (সম্পাদিত) - আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-২০, তৃতীয় মুদ্রণ, মে, ২০০৯, পৃ. ৯৭
২. দত্ত, সন্দীপ, বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন-দশক, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ - বৈশাখ ১৪০০, পৃ. প্রসঙ্গকথা।
৩. বসু, শুদ্ধসত্ত্ব, বাংলা সাহিত্যের নানারূপ; বিশ্বাস বুক স্টল, ৮৮ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ - ১লা ভাদ্র, ১৩৮৫, তৃতীয় মুদ্রণ - ১৭ই আষাঢ়, ১৩৯৯, পৃ. ১
৪. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা, তুলসী প্রকাশনী, ৯/৭বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ - ২৬ আগস্ট, ১৯৯৯, চতুর্থ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ - জুন, ২০০৮, পৃ. ৫৩৬
৫. মণ্ডল, অমরেশ, বিমল করের গল্পশিল্প, একুশ শতক, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ১৬৮
৬. দত্ত, সন্দীপ, বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন-দশক, ঐ, পৃ. ১৯
৭. মণ্ডল, অমরেশ, বিমল করের গল্পশিল্প, ঐ, পৃ. ১৭১-৭২
৮. ঐ, পৃ. ১৭২
৯. ঐ, পৃ. ১৮২-৮৩
১০. ঐ, পৃ. ১৮৩
১১. দত্ত, সন্দীপ, বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন-দশক, ঐ, পৃ. ৩৯
১২. ঐ, পৃ. ৪৬

১৩. ঐ, পৃ. ৪৭

১৪. ঐ, পৃ. ৪৮

১৫. মণ্ডল, অমরেশ, বিমল করের গল্পশিল্প, ঐ, পৃ. ১৮০

ঋণ স্বীকার :

<https://www.rokomari.com>

[অধ্যাপক ঘোষাল, ধনঞ্জয়, মাইতি' প্রগতই, ড. মজুমদার দেবশিস (সম্পাদনা) – বাংলা সাহিত্যে আন্দোলন]

shodhganga.inflibnet.ac.in (Pinki das, Ph.D., Thesis 2014)